এ একবার যোগ দিলে আর বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের গুলি করে মারা হবে।"

লণ্ডনের বৃটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব "সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সম্প্রতি সীমান্তের ঐ ওপারে চলে গেছে" হিন্দুস্তানীরা প্রকাশ্যভাবে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। "এইসব বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোক, সামরিক বাহিনীর লোক এবং অন্যান্যরা।" গার্ডিয়ান প্রতিনিধি একটি বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে হিন্দুস্তানী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবস্থানের পাশে তাঁবু খাটানো একটি শিবিরে রাইফেলধারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের স্বচক্ষে দেখেছেন।

লাগোসের নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন নামক পত্রিকার মে মাসের ১৪ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে, "হিন্দুস্তান পূর্ব পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সীমান্ত বরাবর ছ'টি রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারীদের এইসব কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।"

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিষ্টেম এর প্রতিনিধি আর্নেষ্ট ওয়েদারল ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে নয়া দিল্লী থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে জানালেন: "মুজিব ও তার বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ যে আগে থেকেই সতর্কতার সংগে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার সব রকম আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। এই 'মুক্তি বাহিনীর' প্রথম লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম যা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র গভীর সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরটি একবার ধ্বংস হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে মুশকিলে পড়তেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো, ঢাকা অধিকার করা। যাতে তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। মুজিব বহু দিন যাবৎ বাইরে থেকে সরবরাহ পেয়ে আসছিলেন বলে বিশ্বাস এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। নয়াদিল্লীতে অবস্থিত বহু বিদেশী কূটনীতিবিদ মনে করেন যে এইসব অস্ত্রশস্ত্র একমাত্র হিন্দুস্তান থেকেই আসা সম্ভব ছিলো।

লণ্ডন টাইমস এর প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা দেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন যে বোমা ও বন্দুক সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং "পূর্ব বাংলার বেনাপোল সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে পশ্চিম বাংলার গরিলাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২৮শে এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রেরিত এ, এফ, পির এক খবরে বলা হয়েছে,---"পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য ১০ হাজার প্রাক্তন সৈনিককে সংঘবদ্ধ করা হ'চ্ছে।"

লণ্ডন টাইমস পত্রিকার ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে "হিন্দুস্তান সরকারই প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা দেশ মতবাদটিকে জিইয়ে রাখছে।" পত্রিকাটির কোলকাতা প্রতিনিধি বলেন যে "সীমান্তের কাছাকাছি প্রায় ২০টি শিবিরে

হিন্দুস্তানী ইনস্ট্রাকটাররা প্রায় ৩০ হাজার রিক্রুটকে ট্রেনিং দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে তথাকথিত "স্বাধীন বাংলা দেশ বেতার" হিন্দুস্তানী এলাকায় অবস্থিত। তিনি বলেন, "কয়েক সপ্তাহের নীরবতার পর আজ আবার 'স্বাধীন বাংলা বেতার' এর কণ্ঠ শোনা গেলো। বেতার থেকে ঘোষণা করা হোলো যে কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছে। আজ সকালে আমি একটি বেতার দিক নির্দেশক যন্ত্রের সাহায্যে "স্বাধীন বাংলা বেতার' কোন দিকে অবস্থিত তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, দিকনির্দেশক যন্ত্রে ধরা পড়লো যে 'স্বাধীন বাংলা বেতারের শক্তিশালী ও স্পষ্ট ধ্বনি যেদিকে বাংলা দেশ অবস্থিত সেই পূর্ব দিক থেকে আসছেনা, বরং তা আসছে উত্তর দিক থেকে যেদিক থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ধ্বনি আসে। শহরের অন্য কয়েকটি জায়গা থেকেও আমি অনুরূপ পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই নির্ভুলভাবে ধরা পড়লো উত্তর দিক। উত্তরে চিনশুরা ও মাণ্ডরার কাছে যেখানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ট্র্যান্সমিটার অবস্থিত, সেই দিক থেকেই আসছে 'স্বাধীন বাংলা বেতার-এর ধ্বনি।'

১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় কোলকাতা প্রতিনিধি মার্টিন উলাকটের প্রেরিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। অস্থায়ী বাংলা দেশ সরকারের সদস্যরা 'বাংলা দেশের কোথাও' রয়েছেন বলে হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রগুলোতে যে খবর প্রকাশিত হয়, মার্টিন উলাকট তাকে 'কাল্পনিক' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের সবাই কলকাতাতেই রয়েছেন, আর তাদের রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। প্রতিনিধি আরও বলেন যে গত শুক্রবার তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার যে অনুষ্ঠান হলো, তাতে চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র দিয়ে হিন্দুস্তানীরা এইসব ব্যক্তিদের সাহায্য করেছে। হিন্দুস্তানী সেনাবাহিনীর লোক সাদা পোশাকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিলো।

প্যারিসের লে মণ্ডি নামক ফরাসী দৈনিক পত্রিকার ২০শে এপ্রিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে, "অস্থায়ী বাংলা দেশ সরকার ঘোষণা করা হয়েছে হিন্দুস্তান সীমন্ত থেকে এক মাইল দূরে একটি গাছের নীচে। আসলে যদিও এই সরকার গঠিত হয়েছিলো কলকাতায়, তবুও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিদেশী সাংবাদিকদের দেখানোর জন্য। এই সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানী এলাকার মধ্যেই রয়েছে একথা প্রমাণ করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সাহায্য করা এবং সেখানে অনুপ্রবেশকারী পাঠানো ছাড়াও, হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর সর্বত্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তান এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের কাছে কয়েকটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছে। ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২১ ও ২২ তারিখে দুটি প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। এগুলোতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয়:

(১) ১৬ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কোনরকম উস্কানী ছাড়াই যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে পাকিস্তানী এলকায় (QT 7542) ও (QT 7642) মেশিন গান ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে গোলা বর্ষণ করে।

(২) ১৭ই জুন তারিখে হিন্দুস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা বেআইনী ভাবে পাকিস্তানী এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রামের (RF 6898) দু'জন লোককে হত্যা করে।

(৩) ১৭ই জুন তারিখে ময়মনসিংহের অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সীমান্ত ফাঁড়িতে কোন উস্কানী ছাড়াই একবার সকাল ৫½ টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এবং আবার বেলা ১ টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ছোটখাট অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে গুলি চালানো হয়। এতে ২জন লোক নিহত ও ৩জন আহত হন।

(৪) ১৭ই জুন তারিখে যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে একটি পাকিস্তানী টহলদার দলের ওপর গুলি চালানো হয়।

(৫) জুন মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে হিন্দুস্তানী বাহিনী কোন উস্কানী ছাড়াই ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সীমান্ত ফাঁড়িতে আবার ভারী মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গুলি বর্ষণ করে।

(৬) ১৮ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কুমিল্লা (RR 3499) জেলায় মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি বর্ষণ করে। এতে ৪ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়।

(৭) ১৮ই জুন তারিখে হিন্দুস্তান সেনাবাহিনী কোন রকম উস্কানী ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার সালদানদী এলাকা (RM 2818) যশোর জেলার বেনাপোল ও মসলিয়া এলাকা (QT 8665) এবং সিলেট জেলার চাতালপুর এলাকায় (RH 1703) মর্টার ছোটখাটো অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি বর্ষণ করে।

(৮) ১৮ই জুন হিন্দুস্তানের সশস্ত্র লোকজন দিনাজপুর জেলার কিশোরীগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ির (QD 3158) উপর ১শ রাউণ্ড ৩ ইঞ্চি মর্টার গোলা বর্ষণ করে।

১৯৭১ সালে ৩রা জুলাই, হিন্দুস্তান বিমান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অমরখানার উপর হামলা চালায় সেই তারিখে বেলা সাড়ে বারোটার সময় হিন্দুস্তান বিমানবাহিনীর চারটি জঙ্গী বিমান এবং একটি সশস্ত্র হেলকপ্টার বেআইনীভাবে পাকিস্তানী আকাশসীমার ৬ মাইল অভ্যন্তরে চলে আসে এবং মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গালাবর্ষণ করে। পরে বিকেলের দিকে (৩রা জুলাই) হিন্দুস্তানী এলাকা থেকে ১শ ২০ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে অমরখানার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়।

হিন্দুস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল "Yorkshire Post" পত্রিকা বলেন "পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের উচ্ছেদমূলক তৎপরতা, পূর্ব পাকিস্তানে একটি পশ্চিম বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস এবং গোটা পাকিস্তানকেই ধ্বংস করার তার চক্রান্ত এ সবের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকি-

স্তানের জন্মতারিখ থেকেই এ সবের সূচনা। সেদিন থেকেই হিন্দুস্তান কখনো পাকিস্তানের সৃষ্টিকে মেনে নেয়নি এবং এই রাষ্ট্রকে পঙ্গু করার জন্য সে সব রকম কৌশলই খাটিয়েছে।

লণ্ডনের 'Daily Telegraph" এ David Boshak বলেন, হিন্দুস্তান তার প্রধান প্রতিপক্ষের খণ্ডবিখণ্ড কিংবা দুর্বল হওয়ার মধ্যে তার নিজের মঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না।

তিনি আরো বলেন, "নিরীহ জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য কোন উদ্বেগ নয় বরং তার এই চিন্তাধারাই বাংলা দেশ এর পক্ষে হিন্দুস্তানের প্রচারণা যুদ্ধের পেছনে রয়েছে সমসাময়িক এশীয় বিষয়াদির উপর আরেকজন প্রখ্যাত বৃটিশ ভাষ্যকার Michael Edwards, ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল BBC-র "আজকের বিশ্ব" অনুষ্ঠানের প্রচারিত এক আলোচনায় বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সমর্থনে বিবৃতি দেয়া এবং বিক্ষোভ সংগঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাকে এই পটভূমিকায়ই বিচার করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রীকরণের যে উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে তার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বাংলা বিভাগকে বানচাল করে দিয়ে পশ্চিম বঙ্গীয় নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের প্রাধান্য চাপানো এবং তাদের কলকারখানার কাঁচামালের উৎস পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করছেন।

হিন্দুস্তানের নিজের লেখক ও ভাষ্যকাররা পাকিস্তানের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেননি।

১৯৭১ সালের দোসরা এপ্রিল, হিন্দুস্তানী পত্রিকা "Free Press Journal" বলেন "আমাদের হিন্দুস্তানের কার্যকলাপকে সচেতনভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে।"

পত্রিকাটি আরো বলেন, "কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ পূর্ববঙ্গ হয়তো কাশ্মীরের উপর হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বকে স্থায়িভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হবে।" এর দুদিন আগে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ বোম্বাই এর দৈনিক সংবাদপত্র "The Indian Express" পূর্ব পাকিস্তান হিন্দুস্তানের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের খোলাখুলিভাবে সমর্থন করে বলেন, "এটা একটা সত্যিকারের ঐতিহাসিক ক্ষণ এবং ঠিক এই মুহূর্তই হচ্ছে কাজ করার লগ্ন।" ১৯৭১ সালের ৭ই এপ্রিল হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর Mr. Subramaniam পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহের প্রসঙ্গে বলেন।

হিন্দুস্তানকে যে জিনিসটি অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে তা' এই যে পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া আমাদের স্বার্থের অনুকূল এবং আজ আমাদের সামনে এমন একটি সুযোগ এসেছে যার মতো সুযোগ আর কখনো আসবে না।"

১৯৭১ সালের ১৫ই জুন, হিন্দুস্তানী দৈনিক পত্রিকা "Motherland" এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আরেকজন হিন্দুস্তানী ভাষ্যকার Subramaniam Sevamy

যুক্তি পেশ করেন যে, "পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কাজ নয়। সেটা পাকিস্তানের মাথাব্যথা। আমাদের শুধু দুটো প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া কি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের অনুকূলে? আর যদি তা সত্যিই আমাদের স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে আমাদের এ ব্যাপারে কি কিছু করার রয়েছে? ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড কেবল আমাদের বাইরে নিরাপত্তার জন্যই অনুকূল নয়, তা' আমাদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারও অনুকূলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের একটি মহাশক্তি রূপে গড়ে উঠা উচিত এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নাগরিকদেরকে সু-সংবদ্ধ করতে হবে। আর এজন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা।"

সর্বোপরি, ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন হিন্দুস্তানের প্রধান উজীর স্বয়ং ঘোষণা করেন, "বাংলা দেশ এর অবসান ঘটিয়ে দেয় এমন একটি রাজনৈতিক মীমাংসা হিন্দুস্তান এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেবে না।"

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনাবলীকে তার যথার্থ পটভূমিকায় দেখতে পারি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থীরা যে সব নৃশংস ও অরাজকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়েছে প্রতিবেশীসুলভ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হয়নি। কিন্তু এর ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফেডারেল সরকারের ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল একটি গণআন্দোলনকে দাবিয়ে দেয়া। এখন অবশ্য বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সশস্ত্রবাহিনী আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই এগিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের ২৫ দিনব্যাপী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

আবেগমুক্ত মন নিয়ে এই শ্বেতপত্র দেয়া তথ্যপ্রমাণাদি বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রেসিডেন্ট তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছিলেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে কারণ এ ধরনের মতৈক্য ছাড়া একটা সত্যিকারের ফেডারেল ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। তিনি ধৈর্যসহকারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান, এবং সশস্ত্রকারের সর্বোপরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে এতটা বিলম্বিত করেন যে কেউ কেউ এখন মনে করছেন যে পরিস্থিতি বিষাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা অবশ্য ক্রমেই তাদের দাবী বাড়িয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যান যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা অনুশাসনেও জনগণ তাদের যে রায় দিয়েছেন তা ছিলো একটি ফেডারেশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের জন্য। আলোচনার শেষের দিকে তাদের খসড়া ঘোষণাপত্রে একটি "কনফেডারেশনের" কথা বলা হয়। কনফেডারেশন হচ্ছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট। এ ছাড়াও এই ঘোষণাপত্রে তাদের এই দেশকে ভাগ করার সংকল্পের সুস্পষ্ট আভাস ছিলো। এটা এক দিকে অন্য ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নেতা ও দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। অন্য দিকে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার মৌলিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট যে আইনকাঠামো আদেশ জারী করেন, এবং যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই আইনকাঠামো আদেশের শর্তাবলীরও এটা ছিলো সুস্পষ্ট লংঘন।

আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের সাফল্যের জন্য কতকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী

দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া না হলে একদিকে তাঁরা বেসামরিক প্রশাসনকে অচল করে দেবেন এবং অন্যদিকে সশস্ত্রবাহিনীর অনেকগুলো ইউনিটের আনুগত্য নষ্ট করে হিন্দুস্তানের যোগসাজসে এমন একটা বেকায়দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে তখন তাঁদের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

প্রেসিডেন্ট আপোষ-মীমাংসার জন্য সবরকম চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা রাজনীতিজ্ঞসুলভ কিংবা একটা আপোষমূলক মনোভাবও দেখতে পাননি। কাজেই প্রেসিডেন্ট যে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবেন, শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না দেখে তিনি অতীব দুঃখের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তই নিতে বাধ্য হন।

<u>পরিশিষ্ট 'ক'</u>

প্রেসিডেন্টের নীতি-নির্ধারণী ভাষণসমূহের অংশবিশেষ

২৬শে মার্চ, ১৯৬৯

সামরিক আইন প্রবর্তনের পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগনের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করা, এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। কাজেই, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা এবং প্রশাসন যাতে জনগণের স্বার্থে সন্তোষজনকভাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা। শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যাতে এর আর কোনরকম পুনরাবৃত্তি না হতে পারে, আমি তার ব্যবস্থা করবো। আমি প্রশাসনের প্রতিটি সদস্যকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

স্বদেশবাসি! আমি আপনাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত হিসেবে একটি মজবুত, সুশৃংখল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র দান করা, এবং অন্যান্য যে-সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জনগণের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সেগুলোর সমাধান বের করা।

২৮শে জুলাই, ১৯৬৯

আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি যে বর্তমান পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে তাঁরা যেন জাতীয় স্বার্থের খাতিরে জাতির মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রতি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বগুলোও অবশ্যই পালন করতে হয়। সমস্যাগুলো তুলে ধরা এবং সেগুলোকে প্রশাসনের কাছে পেশ করাটাই যথেষ্ট নয়। সত্যিকারের নেতা যিনি, তাঁর সমস্যা সমাধানের যোগ্যতাও থাকা চাই। আজ জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো সংকটের দিন। আসুন, আজ আমরা আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি—যাতে আমাদের জনগণ বারবার রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন না হয়।

আমার দিক থেকে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এবং রাজনীতিবিদদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমার সরকার আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলবে। এর বিপরীত কথা আপনাদের কেউ বলতে পারবে না।

তবে একটা কথা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই; কোন ব্যক্তি, কোন গ্রুপ, বা কোন দল—ইসলামের মূল নীতি এবং পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করলে, অথবা আমাদের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করলে—তাঁরা দেশের জনগণ ও তাঁর সশস্ত্রবাহিনীর বিরাগভাজন হবে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এ ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যেন না থাকে।

জাতীয় স্তরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি একটি কথা বলতে চাই।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অসন্তোষের একটি কারণ হচ্ছে এই উপলব্ধি যে জাতীয় জীবনের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এবং জাতীয় কর্তব্য পালনের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আমার মতে, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই অসন্তোষ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বেসামরিক প্রশাসন সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অবস্থার সংশোধনের জন্য আমার সরকার কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ক্রমশঃ চলতে থাকবে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে আমি সব সময়ই মনে করেছি যে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকতর অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং, সৈন্যবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগের সংখ্যা অবিলম্বে দ্বিগুণ করার জন্য আমি সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রধানকে আদেশ দিয়েছি। এটা শুধু প্রথম পদক্ষেপ। সৈন্যবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব যাতে ক্রমশঃই বাড়তে থাকে, তাই আমি দেখতে চাই।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯

আমার গত ভাষণে আমি আশা প্রকাশ করেছিলাম যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি মতৈক্য পৌঁছুবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা তা করতে পারেননি। অবশ্যি, তাঁদের অসুবিধেগুলো সবাই বুঝতে পারেন। যা হোক, আমার গত ভাষণের পর থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রেখেছি। এখনও যখন কোন আনুষ্ঠানিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সুতরাং এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন লোকের মতামত আমি পুরোপুরিই জানতে পেরেছি।

এই দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হওয়ার পর থেকেই যে-সব সমস্যা আমার মনকে চিন্তিত করেছে, তারমধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে এই প্রশ্নটি যে কি উপায়ে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু একটি আইনকাঠামো ছাড়া এই উদ্দেশ্য কার্যকরী হতে পারে না। আপনারা জানেন, আমাদের কাছে তা নেই। কাজেই দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার পক্ষে এ ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্বভাবতঃই, আমি এ সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একটি কাঠামোর জন্যে আমি চারটি বিকল্পের কথা ভাবতে পেরেছি।

একটা ব্যবস্থা এই হতে পারতো যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করে তার হাতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারতো। শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে গেলেই কনভেনশনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতো। এটা একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতে পারতো, যদি করেকটি অসুবিধে না থাকতো। প্রধান অসুবিধে ছিলো এই যে এতে দুটো নির্বাচন প্রয়োজন হতো—একটা কনভেনশনের নির্বাচন, আর একটা—কনভেনশন কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। এই পদ্ধতির অন্যান্য এবং অধিকতর গুরুতর অসুবিধে ছিলো এই যে এর ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরে অযথা বিলম্ব ঘটতো। দ্বিতীয় বিকল্প ছিলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন। কিন্তু দেশের উত্তর অংশে এ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিরোধিতা রয়েছে। কারণ এর কয়েকটি বিষয়, যেমন এক ইউনিট ও সমতা, জনগণের কাছে আর গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় বিকল্প ছিলো একটি শাসনতন্ত্র রচনা করে তার ওপর গণভোট অনুষ্ঠান করা। এরও কতকগুলো অসুবিধে ছিলো। কারণ শাসনতন্ত্রের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিলের ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে শুধুমাত্র 'হাঁ' বা 'না' সূচক একটা উক্তির মাধ্যমে তাদের অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ বিকল্প হিসেবে, বিভিন্ন গ্রুপ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা, পাকিস্তানের বিগত শাসনতন্ত্রগুলোর পর্যালোচনা এবং দেশের সাধারণ জনমতের ভিত্তিতে আমি নিজে সাধারণ নির্বাচনের জন্য একটি আইনকাঠামো উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছি। আমার প্রস্তাবিত আইনকাঠামোটি হবে একটি অস্থায়ী আইনকাঠামো।

গভীরভাবে বিবেচনার পর আমি এই চতুর্থ বিকল্পটি গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আইনকাঠামো উদ্ভাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমি আমার জুলাই মাসের ভাষণে উল্লেখ করেছিলাম যে জাতি হিসেবে আমাদের সামনে তিনটি প্রধান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা রয়েছে। প্রথমতঃ—এক ইউনিটের প্রশ্ন; দ্বিতীয়তঃ—একব্যক্তি এক ভোট বনাম সমতার প্রশ্ন; এবং চতুর্থতঃ—কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক।

গত কয়েক মাস ধরে যখন দেশে শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে, তখন আমার মনে হোলো যে এই তিনটি সমস্যার প্রথম দুটি সম্পর্কে নির্বাচনের পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ এগুলো নির্বাচনের ভিত্তি এবং জাতীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এ ছাড়া অন্যান্য কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নও রয়েছে—যেমন, পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার পদ্ধতি; প্রত্যক্ষ পূর্ণ-বয়স্ক ভোটাধিকার; নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং আদালত কর্তৃক সেগুলোর

প্রয়োগ; আইন বিভাগের স্বাধীনতা ও শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে এর ভূমিকা; শাসনতন্ত্রের ইসলামী বৈশিষ্ট্য—যা পাকিস্তানের আদর্শকে রক্ষা করবে। তবে এগুলো নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই; এগুলো মীমাংসিত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমি যে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে আমি আমার গত ভাষণে স্পষ্টভাবে বলেছি যে এগুলোকে যেন নির্বাচনী 'ইস্যু' রূপে ব্যবহার করা না হয়। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মতভেদ কমে আসতে শুরু করেছে। এটা একটা সুলক্ষণ। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি, তবু পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত বিবৃতি এবং সভায় দেওয়া বহুতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এইসব বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে সফরের সময়েও আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও গ্রুপের মধ্যে তেমন কোন মতভেদ নেই। আমি যে প্রথমেই মনে করেছিলাম যে এগুলোকে নির্বাচনী 'ইস্যু' রূপে ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত নয়—আমার সেই মনোভাবকে আরও দৃঢ় করেছে বর্তমানের এই মতৈক্য। আলাপ-আলোচনা ও সুস্থ চিন্তাধারার স্বাভাবিক পথে আমরা এখন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি। এখন যদি এই বিষয়গুলোকে আবার নির্বাচনী হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাহলে তা ভয়ানক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে; অনর্থক তিক্ততার সৃষ্টি হবে; এবং এর ফলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত হবে।

এখন আমি এই তিনটি প্রধান বিষয়ে সর্বসম্মত জনমত সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

এক ইউনিটের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে যে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে বর্তমান এক ইউনিট ব্যবস্থা না রেখে, পশ্চিম পাকিস্তানকে আগের মতো করেকটি প্রদেশে বিভক্ত করাই বাঞ্ছনীয় বলে সকলের ধারণা।

একব্যক্তি এক ভোটের প্রশ্নটিও এখন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মৌলিক প্রয়োজন রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাজেই শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও এখন সকলেই মনে করেন যে একব্যক্তি এক ভোটের আদর্শই আমাদের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হওয়া উচিত। আমি আগেই বলেছি যে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্বেই এক ইউনিট ও প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। কাজেই এই দুটো প্রশ্নের সমাধানের জন্যে আমি যা স্থির করেছি তা হচ্ছে এই:

এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে পুথক প্রদেশ গঠন করা হবে।

অনুরূপভাবে, জনমত অনুসারে আমি একব্যক্তি এক ভোটের আদর্শকে গ্রহণ করেছি। এই গণতান্ত্রিক আদর্শ হবে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ভিত্তি।

কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক; আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, আমার জুলাই মাসের ভাষণে আমি বলেছিলাম যে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের পূর্ণ অংশ পায়নি। তখন আমি একথাও বলেছিলাম যে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের অসন্তোষ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কাজেই, এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন হবে—পাকিস্তানের দুটি অংশে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন—যতোদিন পর্যন্ত তা জাতির ঐক্য ও দেশের সংহতি ব্যাহত না করে।

পাকিস্তানে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়। একটি ফেডারেশনে শুধু আইন সম্পর্কীয় ক্ষমতার বন্টনই থাকে না, তাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বন্টনও থাকে। এ ব্যাপারে আমাদের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—যা একই সঙ্গে প্রদেশসমূহের ন্যায়সঙ্গত দাবীও মেটাবে, আবার কেন্দ্রের যাপরিহার্য প্রয়োজনও পূরণ করবে। পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জনগণ তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করবে—যতোদিন পর্যন্ত তা কেন্দ্রে জাতীয় সরকারের কাজকে ব্যাহত না করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ একই ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই, পাকিস্তানের উত্তর অংশের জনগণ যাতে সমান অংশীদার হিসেবে সমানয়নকভাবে একত্র বসবাস করতে পারে, তার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে একটি সন্তোষজনক সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারার কোন কারণ নেই।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য কাজ করার জন্য আমি যে সময়-সূচী নির্ধারণ করেছি, এখন আমি তার পূর্ণ বিবরণ দিতে চাই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অস্থায়ী আইনকাঠামো ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে ভোটার-তালিকা ১৯৭০ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে। ভোটার-তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, নির্বাচন কমিশন আইনকাঠামোর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের কাজ শুরু করবেন। আপনারা জানেন, জনগণের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি থাকলে, সেগুলো সম্পর্কে ওনানীর পরই সীমা-নির্ধারণ চূড়ান্ত করা হয়। সুতরাং, এ কাজের জন্য কিছু সময় দিতে হবে।

এ ছাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—উত্তর ফেব্রুয়েরি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে আবশ্যকীয় দিক থেকে অসুবিধে দেখা দেবে—জুনের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সময় পর্যন্ত। কাজেই আমি স্থির করেছি যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ হওয়ার পর, প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যেদিন শুরু হবে, সেইদিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি খুশী হবো। তবে জাতীয় পরিষদ যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরিষদ বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে; এবং দেশে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে এমনটি যেন না ঘটে। কাজেই, আমি ভবিষ্যৎ নির্বাচিত প্রতি-

প্রতিনিধিদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা যেন পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান ও দেশাত্মবোধ সহকারে এই কর্তব্যের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

জাতীয় পরিষদে ভোট-পদ্ধতি সম্পর্কে, এ কথাটা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা উচিত যে পরিষদ মৌলিক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শাসনতন্ত্র একটি পবিত্র দলিল; শাসনতন্ত্র একত্র বসবাসের একটি চুক্তি। কোন সাধারণ আইনের সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে না। কাজেই, পরিষদের জন্য যে ভোট-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে, সেটি যাতে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিদের জন্য ন্যায়সঙ্গত হয়—তা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। পরিষদের কাজ শেষ হলে, পরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রটি যথারীতি অনুমোদিত হওয়ার পর তা পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সনদরূপে গণ্য হবে। তখন নতুন সরকার গঠনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

এইসব বিভিন্ন কাজ চলাকালে সামরিক আইন সর্বোচ্চ আইনরূপে বলবৎ থাকবে যাতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজে সাহায্য হতে পারে।

উপসংহারে আমি বলতে চাই যে আমি যে কার্যক্রম প্রস্তুত করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে দেশে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে যে সামরিক আইন বিধি জারী করা হয়েছিলো, তা যথাসময়ে বাতিল করা হবে। তবে আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে কোন বাধা সহ্য করতে আমি প্রস্তুত নই। কোন ব্যক্তি বা কোন গ্রুপ আইন-শৃংখলা সমস্যা সৃষ্টি করলে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিলে—তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারণ গণতন্ত্রের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সহনশীলতা অবলম্বন করা ও বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা। কাজেই সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবশ্যই সাধারণ আচরণের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই। আমি অচিরেই এ বিষয়ে কতিপয় নির্দেশ জারী করবো।

আসুন, এখন আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাই, এবং সভ্য জগতের রীতি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলি।

২৮শে মার্চ, ১৯৭০

১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশ এ মাসের ৩০ তারিখে প্রকাশিত হবে। এই আদেশটি হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের কার্যনির্বাহের মূল ভিত্তি। আমার বিবেচনামত জনমত যাচাই করে এই আদেশটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন আমি এর প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা হবে ৩১৩। এর মধ্যে ১৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য। বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হবে ১৯৬১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

আইনকাঠামো আদেশে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে যখন পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছিলো, তখন আমরা মনে করেছিলাম যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করার

পর। পরে আমার সরকার বিষয়টি আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, তা রাজনৈতিক দিক থেকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। এর প্রধান কারণ এই যে শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে। এ ছাড়া, এর ফলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের দলসমূহ শাসনতন্ত্র রচনার পর আর একটি নতুন নির্বাচনী অভিযানের ঝুঁকি বহনের হাত থেকে রেহাই পাবেন। আমার মতে, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোর মীমাংসা একবার হয়ে গেলেই আমাদের নেতৃবৃন্দের যা করা উচিত—তা আর এক দফা নির্বাচনী অভিযান চালানো নয়; বরং তা হচ্ছে জাতিগঠনের প্রধান কর্তব্যগুলোর প্রতি আত্মনিয়োগ করা। এইসব বিষয় বিবেচনা করে আমি স্থির করেছি যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭০ সালের ২২শে অক্টোবরের মধ্যে। তবে, শাসনতন্ত্র রচিত হলে আমি তা অনুমোদন করার পর যখন প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, তখনই সে পরিষদগুলোর কাজ শুরু হবে।

১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশ প্রকাশিত হলে আপনারা দেখতে পাবেন যে নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কিত তালিকায় জাতীয় পরিষদের ভোট-পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ এ ব্যাপারে পরিষদ স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিলেই ভালো হয়। আর আমি মনেপ্রাণে আশা করি যে এব্যাপারে খুব বেশী মতানৈক্যও দেখা দেবে না। সর্বসম্মত ঐক্যমত হলে তো কথাই নেই। যাহোক, কতোটা মতৈক্য আর কতোটা মতানৈক্য দেখা দিতে পারে, সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইনে। তবে একটা কথা আমি আগেও বলেছি, আবারও জোর দিয়ে বলতে চাইছি। সে কথাটি হচ্ছে এই যে শাসনতন্ত্র একটি সাধারণ আইন নয়, বরং তা একত্র বসবাসের একটি চুক্তি। এজন্যেই এটা একান্ত প্রয়োজন যে জাতীয় পরিষদে যে ভোট-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে, তা যেন সব অঞ্চলের পক্ষে সংগতভাবে সন্তোষজনক হয়। তা না হলে, শাসনতন্ত্রটি সব প্রদেশের ও সব অঞ্চলের জনগণের কাছে সত্যিকারভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আমি নিশ্চিত যে এবিষয়ে একটা উপযুক্ত পদ্ধতি স্থির করা সম্ভব হবে।

আইনকাঠামো আদেশে শুধু যে জাতীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠা, সদস্যসংখ্যা ও গঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে তাই নয় বরং এতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কতিপয় মূল নীতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নীতিগুলোর অধিকাংশেরই ভিত্তি হচ্ছে প্রাক্তন শাসনতন্ত্রসমূহ। তবে আমি প্রাক্তন শাসনতন্ত্রসমূহের কয়েকটি বিষয়কে আইনকাঠামো আদেশে প্রাধান্য দিয়েছি—যাতে জাতীয় পরিষদ এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রথমতঃ, আইনকাঠামো আদেশে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র হবে

এমন, যাতে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমরা সবাই জানি, এই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে হতে হবে এমন—যা অবশ্যই পাকিস্তানের সীমানাগত সংহতি, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আইনকাঠামো আদেশে বলা হয়েছে, যে-সব এলাকা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, সেই এলাকাগুলো অবশ্যই যুক্ত হবে একটি ফেডারেল ইউনিয়নে—যা, 'পাকিস্তান ইসলামী রিপাবলিক' নামে অভিহিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানাগত ঐক্য অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের তৃতীয় মূল নীতি হচ্ছে এই যে এ শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র—যাতে থাকবে গণতন্ত্রের বিভিন্ন মৌলিক উপাদান, যথা—জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিয়মিত ব্যবধানে অবাধ নির্বাচন এবং প্রত্যক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার। এছাড়া, শাসনতন্ত্রে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ।

নতুন শাসনতন্ত্রের চতুর্থ মূল নীতি হচ্ছে এই যে এ শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই হতে হবে একটি প্রকৃত ফেডারেল শাসনতন্ত্র। এতে আইনবিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বিতরণ করা হবে—যাতে প্রদেশগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন, অর্থাৎ—সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনবিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সীমানাগত সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ফেডারেল সরকারের হাতে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ আইনবিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

শাসনতন্ত্রের পঞ্চম মূল নীতি হচ্ছে এই যে এতে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণের জন্য এমন সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে—যাতে তারা সমান অংশীদার হিসেবে সম্মানজনকভাবে একত্র বসবাস করতে পারে, এবং গড়ে উঠবে এমন একটি শক্তিশালী জাতিতে—যে জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কাজেই আইনকাঠামো আদেশে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে অবশ্যই এমন সুযোগ দান করতে হবে—যাতে তারা জাতীয় কর্তব্যের সর্বস্তরে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আইনে এমন বিধি অবশ্যই রাখতে হবে, যার সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের অসমতা, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক অসমতা, দূর করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসমতার দরুন দেশের কোন কোন অঞ্চলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তা আমাদের উত্থানশীল জাতীয়তার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, এই অসন্তোষ দূর করার কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে; এই অসন্তোষের কারণ অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

আমি আশা করি আপনারা সকলেই এব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণকে জাতীয় কর্তব্য

পালনের পূর্ণ সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে—অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিও অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতার কারণে কোন ক্রমেই তাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যাবে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে পৃথক একটি আবাসভূমির আদর্শের ভিত্তিতে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই দেশ। সেই কোরবানীকে আমরা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। কায়েদে আজম বলেছিলেন: "পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যে এসেছে।" তাঁর এই বাণীর মর্ম আমাদের যে-কোন মূল্যে বজায় রাখতে হবে। এ এমন একটা সত্য যা নিয়ে কখনও কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

কোন কোন মহল থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের পক্ষে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। এই ধারণার সঙ্গে আমি আদৌ একমত নই। আমার বিশ্বাস, সংকল্প ও সমঝোতার মনোভাব থাকলে জাতীয় পরিষদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা মোটেই কঠিন হবে না। জাতি তার দায়িত্বশীল জন প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এই সংকল্প ও সমঝোতার মনোভাব আশা করার অধিকার রাখে। আমরা জানি, সদস্যরা তাঁদের বিবেচনার জন্য প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের আকারে দু-তিনটি খসড়া পাবেন। কাজেই, তাঁদের যে একেবারে গোড়া থেকেই সব কিছু শুরু করতে হবে, তা নয়। প্রাক্তন শাসনতন্ত্রগুলোতে প্রস্তাবনা, নীতি-নির্দেশিকা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের মূল কাঠামো আগে থেকেই তৈরী রয়েছে, এবং এর অধিকাংশই এখনও প্রযোজ্য। আমি আরও বলতে চাই যে পরিষদের কাজের সুবিধা ও গতিবৃদ্ধির জন্য আমি সম্ভব সব কিছুই করেছি। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, জনসংখ্যা ভিত্তি, এক ইউনিটের বিলোপ—এগুলো নিয়ে এখন আর কোন প্রশ্ন নেই। পদ্ধতিগত বিষয়ে যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সেজন্য আইনকাঠামো আদেশে নিয়মাবলীর একটি পূর্ণ তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই পটভূমিকা সামনে রেখে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করেই আমার সরকার শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি যুক্তিসংগত সময়-সীমা ধার্য করেছেন। আমাদের বিবেচনায় ১২০ দিনের সময় যথেষ্ট। কাজেই এব্যাপারে আমাদের সব সন্দেহ ও আশংকা ত্যাগ করা উচিত।

আমাদের জনগণ গভীরভাবে দেশপ্রেমিক। কাজেই তারা অনেক কিছুই সহ্য করবে। কিন্তু পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোন কাজই তারা সহ্য করবে না। যদি কেউ মনে করে থাকে যে সে পাকিস্তান ও তার জনগণকে বিপদে ফেলতে পারে, অথবা যদি কেউ আমাদের জনগণের মৌলিক ঐক্য বিনষ্ট করার ধারণা পোষণ করে থাকে—তাহলে সে মস্ত ভুল করছে। জনগণ তা সহ্য করবে না। আমি আগেও বলেছি—শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু কারও এমন কোন সমাধান পেশ করার অধিকার নেই—যা পাকিস্তানের জনগণের সংহতির প্রতি ক্ষতিকর। এটা কেউই সহ্য করবে না। জাতি হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি কোন আক্রমণ করা হলে, আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবো না।